মওদূদী (রহ) : ইসলামের আলোয় আলোকিত এক নেতা

"আল্লাহর দ্বীন সিংহ শার্দুলের ন্যায় বাহাদুর মানবের জন্য অবতীর্ণ, বাতাসের গতিকে পাল্টে দেয়ার হিম্মত রয়েছে যাদের বুকে, যারা অল্লাহর রঙকে প্রাধান্য দেয় ধরার সকল রঙের উপরে, ভালোবেসে অল্লাহর রঙে রাঙাতে চায় বসুন্ধরা। নদীর গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর জন্য মুসলমানকে সৃষ্টি করা হয় নি বরং জীবনের বহমান স্রোতধারার দিক সিরাতুম মুস্তাকিমের পানে ঘুরিয়ে দেয়ার হিম্মত রয়েছে যার, সেইতো মুসলমান"।---- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি টেনে যে মুসলিম জাতি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তর সত্যের আলোয় আলোকিত করেছিল, গাঢ় অমানিষার বুক চিরে যারা ছিনিয়ে এনেছিল সুবেহ সাদেকের স্বর্গীয় আভা, এনেছিল সোনালী সূর্যোদয়, যারা অজ্ঞতা আর মূর্খতার কফিনে পেরেক ঠুকে জ্বালিয়েছিল জ্ঞানের আলো, তারাই একসময় আবার হারিয়ে যায় অন্ধকারে। যাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তারাই পদে পদে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, নীপিড়নের শিকার হয়ে ধুকে ধুকে কীটপতঙ্গের মতো প্রাণ হারাতে শুরু করে। মুসলমানদের অবস্থা এতো সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে অনেকেই নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিতে লজ্জা পেতে শুরু করে, অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে ফিরে যায় পৌত্তলিকতার দিকে। নিজেদের অজ্ঞতা আর অক্ষমতার ঝাল মেটাতে ইসলামকেই তারা তাদের টার্গেটে পরিনত করে দোষারোপ করা শুরু করে, তাদের কাছে মনে হয় দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার মূল ইসলাম। ইসলামের নাম নিশানা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারলেই পৃথিবী হয়ে উঠবে পূতঃপবিত্র, থাকবে না কোন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, হতাশা। অথচ অতীতের দিকে একবারও ফিরে তাকানোর সাহস হয় না তাদের,

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে আলোর মশাল জ্বালানোর হিম্মত, সে তো দূরের কথা।

এমন এক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর দুটো প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর ও ভারত থেকে ইসলামের পূনর্জাগরণের জন্য আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে আসেন জমিয়ত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমুন (মুসলিম ব্রাদারহুড) নামে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যে কুতুব শহীদ (রহঃ) এবং জামায়াতে-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)।

ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, বিশ্বের দিকে দিকে বাজছে যুদ্ধের দামামা, তেমন এক সময়ে ইসলামী আন্দোলনের পূনর্জাগরণ নিয়ে চিন্তা করা এবং মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে অধ:পতিত মুসলিম সমাজকে আবার জ্ঞান রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্যোগ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী গ্রহণ করেছিলেন তা ইতিহাসে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

তার রচিত ১২০টিরও বেশি গ্রন্থ ও প্যামপ্লেট, একহাজারেরও বেশি ভাষণের সংরক্ষিত সাতশত ভাষণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য অমূল্য সম্পদ। আজো বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ইসলামপ্রিয় জ্ঞানপিপাসু জনতাকে ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে চল্লিশেরও বেশি ভাষায় অনুদিত তাঁর অমর সাহিত্যকর্ম।

জন্ম ও শৈশব

যে কারো জীবনী পড়লে প্রথমেই দেখতে পাই, "তিনি একটি সম্বান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন" এমন বাণী জুড়ে দেয়ার রেওয়াজ। তাই সম্বান্ত মুসলিম পরিবার শব্দগুলো একটা হাস্যকর উপমায় পরিণত হয়েছে। তারপরও লিখতেই হচ্ছে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) একটি অত্যন্ত সম্বান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ভারতের দক্ষিণাত্যের (বর্তমান মহারাষ্ট্র) আওরঙ্গাবাদে সাইয়েদ আহমদ হাসানের (১৮৫৫-১৯২০) ঐরসে এবং রোকেয়া বেগমের গর্ভে জন্মলাভ করেন।

তের-চৌদ্দশত বছর ধরে ইসলামী দাওয়াত, দ্বীনি শিক্ষা দীক্ষার কাজে অব্যাহতভাবে শ্রম দিয়েছে আহলে বাইতের এমন একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সম্বান্ত শাখায় তার জন্ম। ভারতীয় চিশতীয়া তরিকতের সবচেয়ে বুযুর্গানে দ্বীন, প্রধান বা বড় পীর হিসেবে পরিচিত খাজা কুতুবুদ্দিন মওদূদ চিশতী (রহঃ) (১০৩৯-১১৩৩ হিজরী) এবং নামকরা বুজুর্গ মাওলানা আবু আহমদ আবদাল চিশতী (রহঃ) (মৃতুয:৯৬৫ ইসায়ী) এ খান্দানেরই সন্তান। যুগ যুগ ধরে এ খান্দান ধর্মীয় অনুশাসন পালনরে পাশাপাশি ধর্মীয় নেতৃত্ব দিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে।

আদর্শ বাবার সংস্পর্শে শৈশবেই মওদূদী (রহঃ) দ্বীনি এলেমসহ ইসলামী আদব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তার বাবা একজন উকিল হলেও মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষে কেস গ্রহণ না করায় এবং ইবাদত ও কৃচ্ছতা সাধনের সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় ওকালতিতে সময়দানের চেয়ে আলেম-ওলামাদের বৈঠকে সময় দেয়াটাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। আলেম-ওলামাদের এসব বৈঠকে তিনি নিয়মিত একান্ত প্রিয় সন্তান মওদূদীকে (রহঃ) নিতেন তালিম দেয়ার জন্য।

পিতার সাহচর্যে তিনি কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলো মুখস্ত করেন, শিখে ফেলেন আরবী ও উচ্চাঙ্গের উর্দু ভাষা। তার শিক্ষার প্রথম দিন থেকেই উর্দু, ফারসী, আরবী, ফিকাহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন তার বাবা। সন্ধ্যাগুলো তার কাটতো বাবার মুখে

নবী-রাসুলদের (আ) কাহিনী শুনে, দ্বীনের মহা-মনীষীদের জীবন গাঁথা শুনে। ফলে অল্প বয়সেই দ্বীনি আকায়েদ, আদাবে জীন্দেগী, শিক্ষা প্রভৃতি তার কোমল হৃদয়ে গেঁথে ফেলেন।

মূলত শিশু মওদূদীর (রহঃ) শিক্ষাগুরু ছিলেন তার বাবা। তার চাল-চলনে কোন ত্রূটি দেখলেই তৎক্ষনাৎ তিনি তা সংশোধনের চেষ্টা চালাতেন, এমনকি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ কাজে লেগেই থাকতেন। ফলে শৈশবেই তিনি চমৎকার চারিত্রিক মাধুর্য অর্জন করেন।

শৈশবে মওদূদী (রহঃ) গৃহপরিচারিকার ছেলেকে মেরেছিলেন একবার। সাথে সাথে বিষয়টি তার বাবার নজড়ে পড়ে যায়। অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হলেন তিনি। কিছুতেই সন্তানের এহেন আচরণ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তৎনাৎ গৃহপরিচারিকার ছেলেকে ডেকে পাঠান। ছেলেটিকে তিনি নির্দেশ নিলেন একইরূপ মার দিতে মওদূদীকে (রহঃ) যেমন মার তিনি দিয়েছিলেন গৃহপরিচারিকার সন্তানকে। এ শিক্ষা মওদূদীর (রহঃ) জীবনে এমন প্রভাব ফেলে যে আমৃতুয তিনি আর কখনো তার অধিনস্ত কোন ভৃত্য কিংবা কর্মচারীর গায়ে হাত তোলেন নি।

শিক্ষা জীবন

"জ্ঞান মুসলমানদের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পাবে কুড়িয়ে নেবে"-হাদীসের এ বাণীটি মওদূদী (রহঃ)-এর জীবনে প্রভাব ফেলেছিল কিনা তা জানা যায় না, তবে শিক্ষার প্রতি তার ছিল আজন্ম অনুরাগ।

মাদরাসায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের পূর্বেই তার বাবা তাকে নিয়ে যান এক আদর্শ শিক্ষক ওস্তাদ মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযীর (মৃতুয ১৯৫৪ ইসায়ী) কাছে।

কথিত আছে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ), মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত বিষয়ে তার সমকক্ষ কোন পন্ডিত সে যুগে ভারত বর্ষে ছিলেন না। কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় তার জ্ঞান-গরিমা ছিল অদ্বিতীয়। অত্যন্ত স্বাধীন চেতা পন্ডিত ছিলেন তিনি এবং এ কারনেই কখনো কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নি বরং আতর বানিয়ে ও তার ব্যবসা করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্থের প্রতি নির্মোহ এই পন্ডিত জ্ঞান দানের বিনিময়ে কখনো কারো কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নি।

ওস্তান নিয়াযী মওদূদীর (রহঃ) বাসার দেড় মাইল দূরে দিল্লীর তুর্কমান দরজার কাছে কুচা পন্ডিত এলাকায় বসবাত করতেন। মওদূদী (রহঃ) বাবা আরবী শিক্ষক হিসেবে ওস্তান নিয়াযীকেই নিযুক্ত করেন। কখনো তিনি পারিশ্রমিক নেন নি বরং পারিশ্রমিকের কথায় তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি ইলম বিক্রি করি না'।

মওদূদী (রহঃ) ওস্তাদ নিয়াজীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভের পরে ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা ফুরকানিয়ায় ভর্তি হন। মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে তিনি ভর্তি হন হায়দ্রাবাদের দারুল উলুম মাদরাসায়। কিন্তু বাবার অসুস্থতা এবং ইন্তেকালে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

কিন্তু শিক্ষার প্রতি যার আজন্ম অনুরাগ জ্ঞানার্জনে কোন কিছুই কি তার প্রতিবন্ধক হতে পারে, না পেরেছে কোন কালে? গত শতাব্দীর বিশের দশকের মধ্যেই তিনি আরবী, ফার্সী, ইংরেজী এবং মাতৃভাষা উদর্ুতে এতোটা বুৎপত্তি অর্জন করেন যে নিজেই স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করা শুরু করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অধ্যয়নের

পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রথিতযশা পন্ডিতদের সাহচর্যে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। এমনকি জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক হবার পর কিছু জটিল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি আবার ওস্তান নিয়াজীর শরনাপন্ন হন। জ্ঞানপিপাসু মওদূদী (রহঃ) ফজরের আজানের মুহূর্তে পায়ে হেটে চলে যেতেন দেড় মাইল দূরে ওস্তাদ নিয়াযীর আস্তানায়। যেদিন ওস্তান অসুস্থ থাকতেন সেদিন আবার ফিরে আসতে হতো তালিম না নিয়েই।

এভাবেই তিনি জ্ঞানার্জনকে তার ব্রত হিসেবে নিয়ে ওস্তাদের স্নেহভাজনে পরিনত হন। তাইতো তার ওস্তান তাকে "সাইয়েদ বাদশা" বলে সম্বোধন করতেন।

মওদূদী (রহঃ) সম্পর্কে ওস্তাদের এতটা অগাধ আস্থা ছিল যে দেশ বিভাগের পর ওস্তাদের এক সাগরেদ দিল্লী থেকে লাহোর হিজরত করলে তিনি তাকে উপদেশ দেন, "লাহোরে প্রথমেই আমার সাগরেদ মওদূদীর কাছে যাবে, অতপর লা-ইলাহা ইল্লাহু-এর অর্থের উপর মনোনিবেশ করবে।"

মওদূদী (রহঃ) দেওবন্দ, মাযহারুল উলুম বা কোন দারুল উলুম কিংবা আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর গ্রাজুয়েশন বা উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারেন নি বলে অনেক ওলামা তাকে আলেমে দ্বীন হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। আর প্রগতিশীলদের তো কথাই নেই। মওদূদীকে তারা মুর্খ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই নারাজ। অথচ এরা আরজ আলী মাতুব্বরকে ঠিকই পন্ডিত মনে করে, এদের প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো ঠিকই হাস্যকর রাশিচক্র ছাপে, তখন তা আর প্রগতিহীন মনে হয় না।

তবে মজার ব্যাপার হলো মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-এর অসাধারন লেখা, তার চিন্তাধারা এবং তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন ও সংগঠনের উপর বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, ছাত্ররা ডক্টরেট করছেন আর তৈরী

হচ্ছে বড় বড় গবেষণাপত্র। আসলে গুটিকয়েক হিংসুটে আলেমের সার্টিফিকেট দিয়ে তো আর কারো মর্যাদার কমবেশী হয় না বরং সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান আল্লাহই বাড়িয়ে দেন, অল্লাহই তাকে সবার শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে
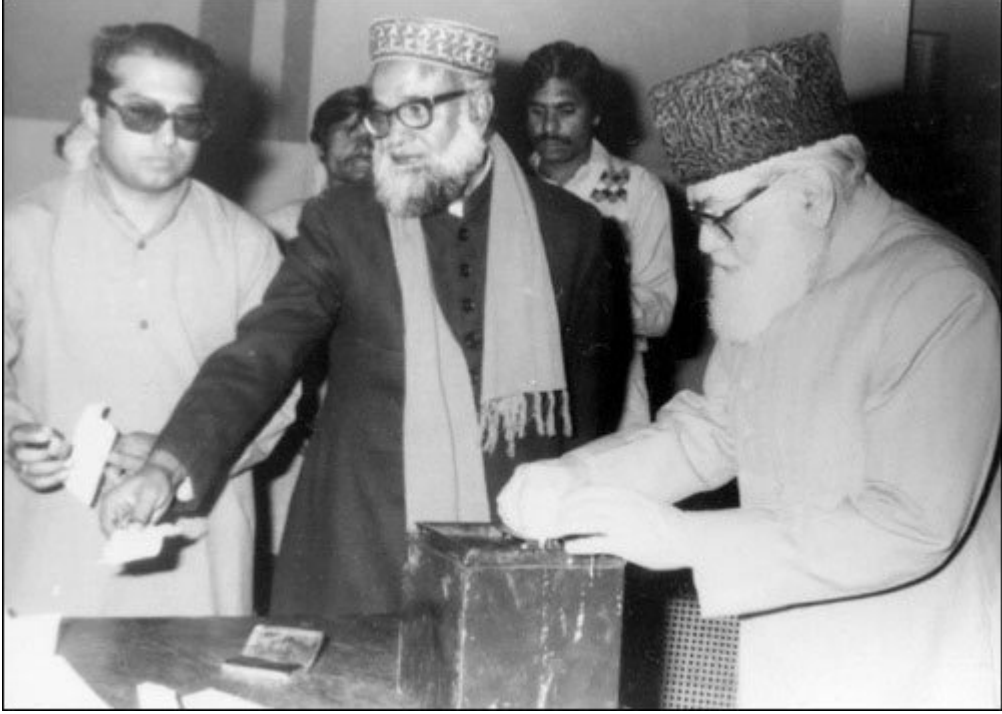
কর্মমুখর জীবন

বৈচিত্রময় কর্মমুখর জীবনের অধিকারী সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)। তার কর্মজীবনের ব্যাপ্তির দিকে তাকালে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় মওদূদী (রহঃ) কোন ব্যক্তি নন, যেন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম।

মওদূদী (রহঃ) তার কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিকতা দিয়ে। বাবার ইন্তেকালের পরে জীবিকার তাগিদেই তাকে ১৯১৮ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়

সাংবাদিকতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পেশায়। অবশ্য আগে থেকেই তিনি একটি শীর্ষস্থানীয় উর্দু পত্রিকায় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন।

তার সাংবাদিকতা জীবন এতটাই সফল যে মাত্র সতের বছর বয়সে ১৯২০ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের জাবালপুর থেকে প্রকাশিত তাজ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এবছরই তিনি দিল্লিতে চলে আসেন এবং মুসলিম পত্রিকার (১৯২১-২৩) সম্পাদনা শুরু করেন। এর কিছু পরেই তিনি আল-জামিয়ত (১৯২৫-২৮) পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তার সম্পাদনায় প্রকাশিত আল-জমিয়ত পত্রিকা ভারতীয় মুসলমাদের প্রধান পত্রিকায় পরিনত হয়। মুসলিম এবং আল-জমিয়ত পত্রিকা দু'টো মুসলিম ধর্মীয় পন্ডিতদের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হত।

মওদূদী (রহঃ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করার সুযোগ পান নি, অথচ আল-জিহাদ ফিল ইসলাম গ্রন্থ রচনার পরে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে লেকচারারের লোভনীয় পদে যোগদানের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি দ্বীনের দাওয়াতের জন্য স্বাধীন ভাবে কাজ করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং এক্ষেত্রে সাংবাদিকতাই তার কাছে শ্রেয় মনে হয়।

মাওলানা মওদূদীর খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগে নি। তার অসামান্য কর্মকান্ড দ্রুত বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি কাড়ে। সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযিয মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) সৌদি আরবের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাদশাহর উপদেষ্টা হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মওদূদী (রহঃ) বিনয়ের সাথে বাদশাহর এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি বলেন, "আমি আমার বর্তমান অবস্থানে থেকেই আপনার সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা। আপনার

যখনই প্রয়োজন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আমার পরামর্শ নিতে পারবেন। যে পরামর্শ সত্য সঠিক তা-ই দিব। তবে নাগরিকত্ব নিয়ে উপদেষ্টার চাকুরী গ্রহণ করলে হয়তো বা সঠিক পরামর্শ নাও দিতে পারি"।

আসলে দূনিয়ার প্রতি কতটা নির্মোহ হলে একজন মানুষ পবিত্রভূমির নাগরিকত্ব এবং বাদশাহর উপদেষ্টা হওয়ার মতো এমন লোভনীয় ও ইর্ষনীয় পদ প্রত্যাখান করা যায় তা ভাবতেই শ্রদ্ধায় মনপ্রাণ ভরে ওঠে।

লেখালেখিতে হাতেখড়ি

"শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কলমের কালি উত্তম"। মওদূদী (রহঃ) তার জীবনে হাদীসের এ বাণীকে এতো গুরুত্ব দিতেন যে কলমকেই তার জিহাদের প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে নেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন জ্ঞানার্জনে এবং গ্রন্থ রচনায়। দিনের শেষে যখন সমগ্র পৃথিবী ঘুমের কোলে মাথা লুকায়, তখন তিনি বসে পড়তেন বইপত্র আর কাগজ-কলম নিয়ে। রাতের পর রাত তিনি পার করেছেন অধ্যয়ন করে, দ্বীনের খেদমতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও সমসাময়িক সমস্যাবলী নিয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনায়।

তিনি নিছক কল্পনাপ্রসুত বিষয়াদি নিয়ে লেখালেখির পক্ষপাতি ছিলেন না, তিনি লিখতেন কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে, পূর্ববর্তী মনিষীদের ইসলামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়ে এককথায় প্রচুর সহায়ক পুস্তক অধ্যয়ন করে। আর এ কারনেই তার যেকোন বই পাঠ করলে শতাধিক গ্রন্থের রেফারেন্স পাওয়া যায়।

তার ক্ষুদ্র জীবনে বারবার তিনি কারা নির্যাতন ভোগ করেন, কিন্তু কারাগারকেই তিনি তার স্টাডিরুমে পরিনত করেন। তার অনেক মৌলিক গ্রন্থ এমনকি তাফহীমুল কোরআনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি জেলখানাতে বসেই লিখে ফেলেন। আর জীবনের শেষ দিকে আমেরিকার বাফেলো হাসপাতালে বসে তিনি লিখতে থাকেন "সিরাতে সরওয়ারে আলম" নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীরাত গ্রন্থ।

লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনি এতো সতর্কতা অবলম্বন করেন যে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেন। তাফহীমুল কোরআন রচনার ক্ষেত্রে তিনি এটা অনুভব করেন যে কোরআন যে পরিবেশে যে পরিস্থিতিতে নাজিল হয় তা না জেনে কোরআনের ব্যাখ্যা করলে অনেক কিছুই অস্পষ্ট থেকে যায়। এজন্য তিনি তাফহীমুল কুরআন রচনার ক্ষেত্রে সৌদি আরব সফর করে কোরআন নাজিলের বিভিন্ন স্থান স্বচক্ষে ঘুরে ঘুরে দেখেন, অনুধাবক করেন ভৌগলিক অবস্থান, স্থানীয় অধিবাসীদের উপর আবহাওয়া ও ভৌগলিক প্রভাব ইত্যাদি। এমনকি যে সকল ক্ষেত্রে চিত্রের প্রয়োজন হয় তিনি মানচিত্র একে সে চিত্রগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালান।

মওদূদী (রহঃ) জীবনের শুরুতেই ১৯২০ থেকে ২৮ সালের মধ্যে একটি আরবী, তিনটি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করে তার লেখালেখিতে হাতেখড়ি দেন। তবে এ সময়ে তার সমচেয়ে মৌলিক কাজ হলো !@খ!১ রচনা। গ্রন্থ রচনার ইতিহাসটি জানলে বুঝা যায় চব্বিশ বছরের টগবগে যুবক ইসলাম নিয়ে কতটা ভাবতেন, ইসলামের দুর্দিনের চিন্তায় কতটা কাতর ছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসে ১৯২৬ সাল মুসলমানদের জন্য এক দুর্যোগপূর্ণ সময়। এ বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আততায়ীদের হাতে মারা যান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন মুসলিম এ কাজের জন্য অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হয়। চারিদিকে হা রে রে রে রবে ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের শ্রাদ্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম, কোরান সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা, যতদিন

কোরআন থাকবে ততদিন বিশ্বে শান্তি আসতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি অপবাদে ইসলামকে বিদ্ধ করা হলো। প্রচার করা হয় শ্রদ্ধানন্দকে ইসলামে শত্রু সাব্যস্ত করে বেহেস্তের আশায় মুসলমানরা এ হত্যাকান্ড চালিয়েছে। অর্থাৎ বিধর্মীদের হত্যা করে মুসলমানরা বেহেস্তে যাওয়ার জন্য সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছে বলে চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়।

অবস্থা এতটা নাজুক আকার ধারন করে যে, অহিংস রাজনীতির প্রবক্তা এবং হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারী হিসেবে তৎকালীন সমাজে পরিচিত গান্ধীজীও মন্তব্য করে বসেন, "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চুড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারী ছিল, এখনও তরবারীই আছে"। মোট কথা ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে একাকার করে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে নেমে পড়ে ইসলামবিরোধীরা।

এমন এক পরিবেশে ২৪ বছরের যুবক মওদূদী দিল্লী জামে মসজিদে জুমুয়ার নামাজে ইমাম সাহেবের আবেগময় খুৎবা শুনে অস্থির হয়ে পড়েন। ইমাম সাহেব বলেন, "হায় খোদা, ভারতবর্ষে আজ যদি এমন কোন আল্লাহর বান্দা ইসলামের জিহাদ নীতির উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করতো, ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইসলামের প্রকৃত রূপ সবার সামনে তুলে ধরতো তবে কতই না ভালো হতো।" যুবকটি নামাজ শেষে মনস্থির করে ফেললো, বুকভরে নির্মল বাতাস টেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো যে আল্লাহ এই নির্মল বাতাস দিয়ে আমার অন্তরকে ভরিয়ে দেন, আমি কেন তার মহিমা ঘোষণার জন্য তার পক্ষে কলম ধরবো না।

২৪ বছরের এ টগবগে যুবক লিখে ফেললেন "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" নামের এক অসাধারন পুস্তক যা ইসলামে জিহাদের প্রকৃত পরিচয় অমুসলিমদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। বইটি এতোটা তথ্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আল্লামা ইকবাল তার এ বইটি পাঠ করে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে ভূয়সি প্রশংসা করেন, "জিহাদ, যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে

ইসলামী আইন-কানুন সম্বলিত এ গ্রন্থটি অসাধারণ ও চমৎকার। প্রত্যেক জ্ঞানী ও সুধীকে গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি"।

যে সময়ে মুসলমানরা বিধর্মীদের অপপ্রচারে ছিল দিশেহারা, সেসময়ে ২৪ বছরের এ যুবক অসীম সাহসে এ গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের পক্ষে যে ভূমিকা রেখেছিল তা আজো অবিস্মরণীয়।

রাজনৈতিক ময়দানে পদচারণা

যে মুসলিম জাতি দোর্দান্ত প্রতাপের সাথে রাজনীতির ঘোড়া দাবড়িয়ে বেরিয়েছে চতুর্দিকে, যাদের নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হয়রত মুহাম্মাদ (সাঃ) রাজনীতিকে রাঙিয়েছেন আদর্শিক রঙে, নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন সত্যের সমরে ইসলামের সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তে শুরু করে তখন তাঁরই অনুসারীরা

"ইসলামে রাজনীতি হারাম" বলে ফতোয়া দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে মসজিদের কোনে খিল এটে ইসলামকে অবরুদ্ধ করে ফেলে।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) উপলব্দি করেন যে মুসলমানদের মাথা উচু করে চলতে হলে কুরআনকে গেলাফের কারাগার থেকে মুক্ত করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দিতে হবে। কুরআন ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ হিসেবে ভুত তাড়ানোর জন্য কিংবা রোগব্যাধি সাড়াতে পৃথিবীতে নাজিল করা হয় নি বরং কোরআনের মূল কাজ হলো সমাজের রন্ধে রন্ধে যে অসুখ দানা বেঁধেছে তার মূলোচ্ছেদ করা। আর এ জন্য কুরআনকে শেলফ থেকে মুক্ত করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মওদূদী রাসূলের (সাঃ) অনুসরণে আদর্শিক রাজনীতির পুর্ণজাগরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেন।

১৯২০ সালের দিকে মওদূদী (রহঃ) রাজনীতির ময়দানে পদচারনা শুরু করেন। শুরুতে তিনি খেলাফত আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং তাহরীক-ই-হিজরতের সঙ্গে জড়িয়ে পরেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তাহরীক-ই-হিজরত তৎকালীন সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের সদলবলে আফগানিস্তান হিজরতের জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু তার কাছে সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল আরো বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত বলে মনে হয় এবং এক্ষেত্রে তিনি সংগঠনের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ফলে তিনি এ আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা ও জীবিকার কাজে বেশি নিমগ্ন হন।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) ইতোমধ্যে তার রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, নীবিড় অধ্যয়ন ও জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাকে ঢেলে সাজান এবং জামায়াতে ইসলামী নামে একটি আদর্শ ইসলামিক সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সংগঠনে তিনি প্রতিষ্ঠাতা আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। শারীরিক অনুস্থতার কারনে তিনি এ বছরই আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যহনি নেন।

শুভ পরিণয়

বারো বছরের কিশোরী মাহমুদা বেগম এক্কা দোক্কা খেলার ছলে পা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরী করেন। গর্তটা থেকে পা উঠিয়ে এবার হাতটি রাখলেন। নরম কাদামাটির গর্তে হাতটি ঢুকাতেই শক্ত পাথরের মতো একটা টুকরোর সাথে হাতে ঠোক্কর লাগে। গর্ত থেকে হাতটি তুলতেই তার চোখ চানাবড়া হয়ে যায়। হাতের তালুতে উঠে আসে জ্বলজ্বলে উজ্জল এক হিরের টুকরো। কিছুতেই দৃষ্টি ফেরানো যায় না অমন হিরে থেকে।

মুহূর্তেই চারপাশে লোক জড়ো হয়ে যায়। সবাই অবাক, এতো সুন্দর হিরে পেল কোথায় মেয়েটা। মুরুব্বীরা সাবধান করে বললো, খুব সাবধানে রাখো হিরেটি বেটি, যত্ন করে রেখো, পাছে আবার কেউ ছিনিয়ে না নেয়।

ভোর রাতে অদ্ভুত সুন্দর এ স্বপ্নে ঘুম টুটে যায় মাহমুদা বেগমের। ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসলেন তিনি। বারবার তাকাচ্ছেন হাতের মুঠির দিকে। একটু আগের স্বপ্নটা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখনো যেন হাতের মুঠোয় রয়েছে হীরের টুকরোটি, হাত খুললেই যেন অদৃশ্য হয়ে যাবে। নামাজের জন্য মা ডাকার আগ পর্যন্ত বিছানায় ঠায় বসে রইলেন হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে।

এক অব্যক্ত ভালোলাগা নিয়ে চোখে মুখে স্বপ্নের আবীর মেখে বার বছরের কিশোরী মাহমুদা ছুটে যান বাবা সাইয়্যেদ নাসির উদ্দিন শামসীর কাছে। খুলে বলেন তাকে স্বপ্নের কথা। বাবাও অবাক, মেয়ের অমন স্বপ্নের কথা শুনে। তিনি কাউকে স্বপ্নের কথা বলতে বারন করে দিলি্লর একজন বড় আলেমের কাছে ছুটে যান। খুলে বলেন মেয়ের স্বপ্নের

সবকিছু। আলেম হেসে বলেন, আপনার মেয়ের এমন এক আলেমে দ্বীনের সাথে নিকাহ হবে যার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বময়।

নাসির উদ্দিন দিল্লীর সাইয়্যেদ বংশের সন্তান। লিল্লীতে তার যেমন রয়েছে যশ, খ্যাতি, তেমনি বেশ স্বচ্ছলও ছিলেন তিনি। ফলে দিল্লীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে মাহমুদা বেগমের জন্য একে একে আসতে থাকে বিয়ের পয়গাম। কিন্তু কিছুতেই যোগ্য পাত্র হিসেবে কাউকে মনপুত হচ্ছিল না।

মওদূদী (রহঃ) এর মা রোকেয়া বেগম যখন ছেলের জন্য নাসির উদ্দিনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন কেন যেন নাসির উদ্দিনের মনে হলো এ পাত্রের জন্যই তিনি অপেক্ষা করছেন। সাদাসিধে অথচ স্পষ্টভাষী মওদূদীর কথা তাকে চমৎকৃত করে। মওদূদী স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন, তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিস্কার, তিনি কোনক্রমেই এর সাথে আপোষ করবেন না। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল অবস্থায়ও তিনি কোনক্রমে তার মিশন থেকে পিছপা হবেন না।

মাহমুদা বেগমের দাদাও অত্যন্ত খুশী হন মওদূদীর (রহঃ) স্পষ্টভাষণে। তিনি পরবর্তীতে চিঠি লিখে বিয়ের সম্মতি জানান। তিনি লেখেন, আমাদের মেয়ে রাজপ্রাসাদেও তোমার সাথী হবে, আর কুড়ে ঘরেও তোমায় সঙ্গ দেবে"। মাহমুদা বেগমের হৃদয়ে দাদার এ কথা এতো প্রভাব ফেলে যে আজীবন যে কোন কাজকর্ম বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দাদার এ কথা তাকে সাহসী করে তোলে।

১৯৩৭ সালের ১৫ মার্চ, সোমবার মওদূদী (রহঃ) ও মাহমুদা বেগম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তৎকালীন সময়ে দিল্লীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে সোয়া লাখ টাকার নীচে মোহরানা বেধে দেয়াকে অপমানজনক মনে করা হতো। তাই সবাই সোয়া লাখ বা তার বেশি মোহরানা নির্ধারণ করলেও আদায়ের ব্যাপারে থাকতেন উদাসীন। কিন্তু মওদূদী (রহঃ) মোহরানা

আদায়কে ফরজ হিসেবেই গণ্য করতেন তাই তিনি স্পষ্টভাষায় জানান, দু'হাজার টাকার বেশি তার পক্ষে মোহরানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে পরিমাণ টাকার মোহরানা আদায় করা তার পক্ষে অসম্ভব তা বেধে তিনি প্রতারণার পথে পা বাড়াতে চান না।

অবশেষে মাত্র দু'হাজার টাকা মোহরানায় বিয়ে করেন মওদূদী (রহঃ)। আর বর পক্ষ থেকে কনেকে দেয়া হয় মাত্র একটি শাড়ী ও একটি আংটি।

বিয়েকে যারা শুধুমাত্র উৎসবই মনে করে, বিয়ের পরে মোহরানা আদায়ের ব্যাপারটি বেমালুম ভুলে যায় মওদূদী (রহঃ) তাদের দলে ছিলেন না কিংবা বিয়ের জন্য ধার দেনা করে উৎসব করে আগামীর দিনগুলোকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে হাপিত্যেশ করার দলেও তিনি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে মওদূদীর (রহঃ) এর সাদাসিধে বিয়ে তৎকালীন দিল্লীর সম্বান্ত সমাজে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সংবিধান প্রনয়ণ আন্দোলনে

সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাক পর্যন্ত ডুবে ছিলো হাজারো সমস্যায়। এর মধ্যে দেশের জন্য একটি আদর্শ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা হয়। যারা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রকৃত পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের সত্যিকারের ধারণা বা সদিচ্ছা ছিল কিনা তা একটি বিশাল প্রশ্ন হয়ে আছে। যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করেছেন, যারা ইসলামের নাম নিয়ে লাখো মুসলমানকে ভারত থেকে পাকিস্তানে হিযরত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সাতচল্লিশে যাদের জন্য হাজার হাজার

সাধারণ মুসলমান শিখ ও হিন্দুদের সম্মিলিত দাঙ্গায় শহীদ হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোক পৌত্রিক ভিটেমাটি হারিয়ে পাকিস্তানে উদ্বাস্তু হয়েছেন, তারাই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুখোশ খুলে স্বরূপে আবির্ভূত হন।

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, দস্তর হোগা আল কোরআন"। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান হবে কোরআনের আইন অনুযায়ী এমন স্বপ্নে বিভোর হয়ে যে সকল সাধারণ মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবের্াচ্চ ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর স্থাপন করেছেন তারাই এক সময় দেখতে পেলেন যে তাদের স্বপ্নের পাকিস্তান আসলে কোন ইসলামী রাষ্ট্র হবে না বরং পাকিস্তানকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তান নেতৃবৃন্দ তলে তলে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন যে আদৌ সম্ভব নয় এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন যুক্তি সরকার নিয়ন্ত্রিণ প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। (বিস্তারিত: টীকা ১ দ্রষ্টব্য) ফলে সাধারণ জনতা পাকিস্তান সরকারের এমন দূরভিসন্ধি জানতে পেরে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পাকিস্তানের সংবিধান কোরআনের আইনের ভিত্তিতেই হতে হবে এমন দাবী নিয়ে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) পাকিস্তান সরকারের দূরভিসন্ধির বিপক্ষে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে জটিলতায় বিচলিত হয়ে রচনা করেন "ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন" এবং "ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি" শীর্ষক দু'টি অসাধারণ বই। স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়েন তিনি, দেশটি স্বাধীন হওয়ার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ আটচলি্লশ সালের ৪ মে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে উনিশ মাস পচিশ দিন কারানির্যাতন চালিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পথকে নিষ্কন্টক করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের ২১ জানুয়ারী পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় একুশ জন প্রসিদ্ধ আলেম করাচী মহানগরীতে সমবেত হয়ে পাকিস্তান সংবিধানের ২২দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করেন যা পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের শক্তিশালী 'চার্টারে' পরিগণিত হয়। সরকারী ইসলাম বিরোধী প্রচার প্রপাগান্ডা আলেমদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও সংবিধান প্রণয়ন তিমিরেই থেকে যায়। ফলে জামায়াতে ইসলামী ৯ দফা (বিস্তারিত টীকা ২ দ্রষ্টব্য) দাবী আদায়ের জন্য জগগণের স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় একান্ন সালের ২১ নভেম্বর মাওলানা মওদূদী (রহঃ) করাচীতে ৯ দফা দাবীতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, যদি এবারের শাসনতন্ত্রের খসড়াটি পূর্বের মতোই অনৈসলামিক হয়, তাহলে ইসলামী জনতা উক্ত খসড়া তার প্রণেতাদের মুখের উপরই ছুঁড়ে মারবে।

এরই বছর খানেক পর ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের দাবীর পাশাপাশি "কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীতে আরো একটি আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। মওদূদী (রহঃ) কাদিয়ানী সমস্যা সমাধানে আলাদা আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন না বরং একে তিনি সংবিধান প্রণয়ন আন্দোলনেরই অংশ মনে করতে।

কাদিয়ানী সমস্যা

বাংলাদেশে কাদিয়ানী ফেতনা খুব একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। বিশেষ করে দেশের সকল স্থানে কাদিয়ানীদের তৎপরতা না থাকায় তাদের সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের যেমন সঠিক জ্ঞান নেই তেমনি ওদের সম্পর্কে জানার আগ্রহও দেখা যায় না। তারপরও কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের একটি সমপ্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে। এমনকি শিশুদের সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের একটি মযহাব হিসেবে উল্লেখ করে কোমলমতি শিশুদের ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সাধারণ মুসলমানরা যেহেতু কাদিয়ানীদের সম্পর্কে খুব কমই জানেন তাই তারা কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাদের অনেকেই কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদেরই একটি সমপ্রদায় মনে করে।

অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কাদিয়ানীরা আদৌ মুসলমানদের কোন সমপ্রদায়নয়৷ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করতেন এবংতার অনুসারীরা তাকে নবী, মসীহ মওউদ (আঃ), প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমামমাহদী বলে দাবী করে৷ এমনকি কাদিয়ানীদের পুস্তক পড়লে জানা যায় যেতারা মুসলমানদেরকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী না মানার কারনেকাফের সাব্যস্ত করে৷ বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েবসাইট আল-ইসলাম ডট অর্গ দেখে নিতে পারেন৷

হযরত ঈসা (আঃ) নবুয়ত দাবী করে নিজের প্রচারিত ধর্মকে পূর্ববর্তী ধর্ম ইহুদী ধর্ম বলে দাবী করেন নি বরং তার অনুসারীরা খৃষ্টান নামে পরিচিত, তার ধর্ম খৃষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত, তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত দাবী করে কখনোই বলেনি যে তার অনুসারীরা খৃষ্টান বরং তার অনুসারীরা মুসলমান নামে আলাদা একটি জাতির সৃষ্টি করেছে যাদের ধর্ম ইসলাম। তাহলে নতুয়তের এই নতুন দাবীদার কেন তার ধর্মকে

ইসলামের উপর চাপিয়ে দিতে চান, কেন তার অনুসারীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হবে না, কেন তারা তাদের স্বতন্ত্র একটি নাম নেবে না। নেয় না এই কারণে যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আদৌ কোন নবী ছিলেন না বরং তিনি একজন প্রতারক, ভন্ড ছিলেন যার কাজ ছিল মুসলমানদের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি করা।

কাদিয়ানীয়াত যে আলাদা একটি ধর্মমত, ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এটি মেনে নিলে কোন সমস্যা থাকে না। একজন সংখ্যালঘু হিন্দু বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ যেমন ধর্মকর্মে স্বাধীনতা পান কাদিয়ানীরাও ঠিক তেমনি স্বাধীনতা পাবে তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় অনুসাশন পালনে। কিন্তু অমুসলিম হয়েও মুসলমান নাম ধারন করে মুসলমানদের ভেতর ফেৎনা সৃষ্টি করবে তা আদৌ মেনে নেয়া যায় না।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার জন্য এ কারনেই প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু আগেই বলেছি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এ জন্য আলাদা আন্দোলনের পরিবর্তে সংবিধান প্রণয়ন আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে এ আন্দোলন চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাই কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার আন্দোলনের সাথে সবক্ষেত্রে একমত ছিলেন না।

কিন্তু কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীটি অল্প সময়েই জনতার দাবীতে পরিণত হয়। বিশেষ করে এ দাবীতে পাকিস্তানের সবগুলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন বিশেষ করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, মজলিশে আহরার, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তে আহলে হাদীস, আঞ্জুমানে তাহাফফুযে হুকুমে শিয়া প্রভৃতি দলগুলো অংশগ্রহণ করে। মূলত এ আন্দোলনটি ছিল পাকিস্তানের আপামর মুসলিম জনতার আন্দোলন আর এ আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি এতটাই প্রভূভক্ত ছিল যে তাদের অনুমোদন ছাড়া এমন ইসুযতে মাথা নোয়াতে চাইছিল না। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান প্রশাসনে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাদিয়ানীদের এতোটাই

প্রভাব ছিল যে তাদের বিরাগভাজন হলে পাকিস্তান পাশ্চাত দূনিয়া থেকে সকল অনুকম্পা আদায়ে ব্যর্থ হবে এমন ভয়ে ভীত হয়ে কাদিয়ানীদের বিপক্ষে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান সরকার। আর এ কারনে ১৯৫৩ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠেয় সর্বদলীয় কনভেনশনে ডাইরেক্ট একশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ডাইরেক্ট একশনের পক্ষে ছিল না, ফলে উক্ত কনভেনশন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি ডাইরেক্ট একশনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং উক্ত কনভেনশনের সাথে জামায়াকের সম্পর্কচূযতির ঘোষণা করেন।

পরের দিনই ডাইরেক্ট এ্যাকশন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয় এবং জামায়াতে ইসলামী যে ডাইরেক্ট একশনের সাথে ছিল না তার বড় প্রমাণ হলো মওদূদী (রহঃ)-কে ডাইরেক্ট একশনের জন্য অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হয় নি এমনকি পাঞ্জাব গোলযোগের সরকারী দলিল মুনির রিপোর্ট-এরকোথাও মওদূদীকে (রহঃ) পাঞ্জাব গোলযোগের জন্য দায়ী করা হয় নি।

ডাইরেক্ট একশন

কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশন ১৯৫৩ সালের ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কাদিয়ানী সমস্যাকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে বরং ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন আন্দোলনের মধ্যেই শামিল করার জোর দাবী জানান। কিন্তু একের পর এক অনুরোধ, মিটিং, মিছিল প্রভৃতি করেও যখন কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সম্মত করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায় তখন সর্বদলীয় কনভেনশন সরকারের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন ঘোষণা করে বসে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কিংবা জামায়াতে ইসলামী কোনভাবেই ডাইরেক্ট একশনের পক্ষে ছিল না বরং সর্বদলীয় কনভেনশন থেকেই জামায়াত কনভেনশনের সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করে। এমনকি ৪ ও ৫ মার্চ, ১৯৫৩ তারিখে

অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে ডাইরেক্ট একশনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এর ভয়াবহ পরিণতির কথা বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে ডাইরেক্ট একশন থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়।

ডাইরেক্ট একশন ঘোষণার পরের দিন করাচীতে ডাইরেক্ট একশনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে ফলে করাচী শহরে ডাইরেক্ট একশন কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে এ আন্দোলন রক্তাক্ত পরিনতির মাধ্যমে শেষ হয়। সরকার বিরোধী এ আন্দোলনের শুরু থেকেই পুলিশ মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করে এবং ৪ মার্চ ১৯৫৩ তারিখে জনসাধারণের আন্দোলনে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে।

মূলত: পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতা হারানোর ভয়ে জনসাধারণের দাবীকে যে কোন মূলে দমনের জন্য শান্তিপূর্ণ পথ পরিহার করে শক্তি প্রয়োগের জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করে। এদিনই জনৈক ছদ্মবেশী পুলিশ আন্দোলন কারীদের উস্কে দেয়ার জন্য মিথ্যে গল্প ফাঁদে যে, পুলিশ এক স্থানে মিছিলে গুলি চালিয়েছে এবং জনৈক মিছিলকারীর গলায় বাধা কোরআন শরীফ লাথি মেরে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। এমনকি ঐ ছদ্মবেশী পুলিশ কিছু ছেড়া কোরআনের পাতা সবাইকে প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়ে

আন্দোলনের আগুণে ঘি ঢেলে দেয়। এর ফলে সাধারণ জনতার পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

একই দিন ডাইরেক্ট একশন আন্দোলনকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে একটি জীপ গাড়ি থেকে আমজনতার উপর ব্যাপক গুলি বর্ষণ করা হয়। পরে জানা যায় জীপের আরোহীরা সবাই কাদিয়ানী এবং এটা একটি পরিকল্পিত আক্রমন। এসব কারণে সরকার বিরোধী এ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ডাইরেক্ট একশন দমাতে পাঞ্জাব পুলিশ জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে ৪ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ৬ই মার্চ সামরিক আইন জারী হয় এবং সেনা ও পুলিশের গুলিতে ১১ জন সাধারণ লোক নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীতে সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক আহূত ডাইরেক্ট একশন সেনা হস্তক্ষেপে অবশেষে সমাপ্ত হয়। এ আন্দোলনে পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ১১ জন নিহত হলেও এখনো অপপ্রচার রয়েছে যে হাজার হাজার কাদিয়ানী এ গোলযোগে প্রাণ হারায়। আবার জামায়াতে ইসলামী এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ডাইরেক্ট একশনের বিরোধী হওয়ার পরও কোন এক অদৃশ্য কারনে মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে এ ঘটনার দায় চাপানোর চেষ্টা চালানো হয়। অথচ সরকারী নথিপত্র এবং তৎকালীন পত্রপত্রিকা প্রমাণ করে যে জামায়াতে ইসলামীর এ আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আবার এ ডাইরেক্ট একশন কোনক্রমেই কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ছিল না বরং এটা ছিল কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীতে সরকার বিরোধী একটি কর্মসূচী কিন্তু এটাকে কাদিয়ানী দাঙ্গা নাম দিয়ে আজো ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চলছে।

আসলে দ্বীনের পথে যারা কাজ করেন, আল্লাহ রঙে যারা নিজেদেরকে রাঙাতে চান, যারা কাউকে ভালোবাসেন কিংবা ঘৃণা করেন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্থাৎ যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, আজো নেই। ইসলামের পক্ষে দাড়ালে, শান্তির পক্ষে দাড়ালে যুগে যুগে বাধা

এসেছে, আক্রমন এসেছে, মিথ্যে প্রচার প্রপাগান্ডার জোয়াড় বয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর পথের সৈনিকদের সত্যের পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করা যায় না। কারণ তারা জানেন, সত্যের জয় অবিস্মম্ভাবী।

ফাঁসির আদেশ

কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীতে সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক ডাইরেক্ট একশন সেনা হস্তক্ষেপে থেমে যায়, একই সাথে থেমে যায় ১১টি তাজা প্রাণের স্পন্দন। ডাইরেক্ট একশনের মতো একটি আত্মঘাতি পরিকল্পনার বিরোধীতা করে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যে কতটা বিচণতার পরিচয় দেন তা পরবর্তী হৃদয়বিদারক পরিনতিই স্বাক্ষ দেয়। তার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ডাইরেক্ট একশন থেকে যেমন বিরত থাকে তেমনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা ডাইরেক্ট একশনের তীব্র বিরোধীতা করে জনগণকে ভয়াবহ পরিনতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য ডাইরেক্ট একশন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তার এ পরামর্শ যে কতটা সময়োপযোগী ছিল তা পরবর্তী ফলাফলই বলে দেয়। সেদিন যদি সাধারণ জনগণ মওদূদী (রহঃ)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে ডাইরেক্ট একশন থেকে বিরত থাকত তাহলে পাঞ্জাবজুড়ে অস্থিতিশীলতা কিছুতেই ছড়িয়ে পড়তো না।

ডাইরেক্ট একশনের সাথে যুক্ত না থাকলেও কাদিয়ানী সমস্যাটিকে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) কখনোই খাটো করে দেখেন নি বরং কাদিয়ানী সমস্যার একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন। তার এ চেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি রচনা করেন কাদীয়ানি মাসালা অর্থ্যাৎ 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তিকা। এ পুস্তিকায় তিনি কাদিয়ানী মতাদর্শের চুলচেরা বিশেষণ করেন এবং কাদিয়ানীরা যে মুসলিম কোন সমপ্রদায় নয় বরং সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধর্মমত তা কাদিয়ানীদের বিভিন্ন পুস্তক-প্রকাশনা এবং কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিভিন্ন বাণী লিপিবদ্ধ করে পরিস্কারভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এ

পুস্তিকায় একটি ছত্রও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সহিংস বা হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে লেখা হয় নি বরং কাদিয়ানী সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের দিক-নির্দেশনা প্রদান করার জন্য মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এটি রচনা করেন।

পূর্বেই বলেছি, নব্যগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়নের জন্য মাওলানা মওদূদী (রহঃ) আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই পাকিস্তান সরকার প্রতিনিয়ত তাকে প্রতিহত করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। কিন্তু ইসলামী শাসনতন্ত্র যেহেতু পাকিস্তানের আপামর জনতার দাবীতে পরিণত হয় তাই পাকিস্তান সরকার মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) কৌশলে জব্দ করার জন্য ফন্দি আটে। এ সময়ই পাঞ্জাব গোলযোগকে ব্যবহার করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে মেতে ওঠে পাকিস্তান সরকার। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যেহেতু ডাইরেক্ট একশনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না তাই পাঞ্জাব গোলযোগের জন্য কোনভাবেই তাকে দায়ী করে গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু পাঞ্জাব গোলযোগের এমন একটা মোম সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মওদূদীকে (রহঃ) গ্রেফতার করতে পারলে পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনকে বাগে আনা যাবে এমনটা ভেবেই পাকিস্তান সরকার পাঞ্জাব গোলযোগের উস্কানিদাতা হিসেবে মিথ্যে অপবাদে ১৯৫৩ সালের আটাশে মার্চ তারিখে মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) গ্রেফতার করে।

মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) গ্রেফতারের কারন হিসেবে মিথ্যে অভিযোগ করা হয় যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ)! কাদিয়ানী মাসালা নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মাঝে বিদ্বেষ প্রচার করেছেন এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আসলে বর্তমান সময়ে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিভিন্ন বইপত্র না পড়েই যেমন অনুমান করে বা অন্যের মুখে শুনে মিথ্যে প্রচারণা চালানো হয়, পাকিস্তান সরকারও ঠিক একই কাজটিই সেদিন করেছিল।! কাদিয়ানী মাসালা অথর্াৎ কাদিয়ানি সমস্যা বইটির নাম শুনেই তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এটা ভেবে বসে যে! বইটি নিশ্চয়ই বিদ্বেষসৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর কোন গ্রন্থ। মূলতঃ মওদূদীর (রহঃ) বইটি তারা একবার পড়ে দেখারও চেষ্টা চালায় নি বরং বইয়ের নামটি পড়েই মওদূদীকে (রহঃ) জব্দ করার মোম হাতিয়ার পেয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে।

যখনই কোন বইয়ের জন্য লেখক বা প্রকাশককে গ্রেফতার করা হয় নিশ্চয়ই সে বইটি সরকার আগে বাজেয়াপ্ত করে, কারন কোন বইকে বাজেয়াপ্ত না করে সে বইটি লেখার দোষে কাউকে গ্রেফতার করার কোন কারন থাকতে পারে না। অথচ কাদিয়ানী মাসালা বইটি কোনদিন কোন কালেও বাজেয়াপ্ত করা হয় নি, না মওদূদীর (রহঃ) গ্রেফতারের পূর্বে, না গ্রেফতারের পরে, এমনকি আজো বইটি বাজেয়াপ্ত হয় নি। বরং এ বইটির রচনার দায়ে মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) গ্রেফতারের পর করাচীসহ পাকিস্তানের রাজপথগুলোয় প্রকাশ্যে হাজার হাজার কপি কাদিয়ানী মাসালা পুস্তিকাটি বিক্রি হয়েছে।

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাদিয়ানী মাসালা পুস্তিকাটি রচনার দায়ে ১৯৫৩ সালের ৮মে তারিখে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীকে (রহঃ) পাকিস্তান শামরিক আদালত মৃতুযদন্ড ঘোষণা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রহসনের বিচার আর কোথাও হয়েছে কি না জানা নেই। যে পুস্তিকা রচনার জন্য লেখককে ফাঁসির দন্ড দেয়া হল সেই পুস্তিকার একটা শব্দ নিষিদ্ধ করার সাহস পেল না এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোন সভ্যদেশে ঘটতে পারে না।

আসলে যে কোন মূল্যে ইসলামী আন্দোলনের এ সিপাহশালারকে পৃথিবী থেকে সড়িয়ে দিতে হবে, যে কোন মূল্যে পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করতে হবে, যে কোন কৌশলে পাকিস্তানের সংবিধানকে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে না করে পাশ্চাত্য প্রভুদের রঙে রাঙাতে হবে এমন একটা ইচ্ছে বাস্তবায়নের জন্যই মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) মৃতুযদন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য আজো মাওলানা মওদূদীর (রহঃ) এই মুতৃযদন্ডাদেশকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং তাকে নিকৃষ্টতম অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে। কিন্তু কাদিয়ানী মাসালা বইটি যে একবার পড়েছে, তার পক্ষে আদৌ সম্ভব মাওলানা মওদূদীকে (রহঃ) একজন ভয়ংকর অপরাধী সাব্যস্ত করার? না তা সম্ভব নয়, বরং মাওলানা মওদূদীর (রহঃ) কাদিয়ানী মাসালা সহ অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যগুলো পড়লে তার প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনের একজন সত্যিকারের সিপাহশালার হিসেবে তাইতো তাকে আজো বিশ্বের দেশে দেশে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।